ইসলামী রাজনীতি ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বিরোধিতার অন্তরালে

আঞ্জুমানে আয়িম্মায়ে মাসাজিদ

ইসলামী রাজনীতি
ও
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি

বিরোধিতার অন্তরালে

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী কেবলমাত্র অজ্ঞ ও জ্ঞানপাপীরাই করতে পারে

চলমান রাজনীতিতে এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারী সেক্যুলারপন্থী রাজনীতিক, বুদ্ধিজীবী, সুশীল ও কলামিষ্টরা দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীতে মরিয়া হয়ে উঠেছেন। তাদের দাবীর পেছনে যুক্তির বহর দেখে বুঝতে মোটেই কষ্ট হয় না যে এদের ইসলাম সম্পর্কে আদৌ সুস্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। দুর্ভাগ্যক্রমে এসব আঁতেলদের পারিবারিকভাবে দ্বীনি প্রশিক্ষণ কপালে জোটেনি, শিক্ষা জীবনে ইসলামের ধারে কাছেও ঘেঁষেনি, পরিণত বয়সে এসে ইসলামী জীবনাচারণে না ঘরকা না ঘাট্‌কা অবস্থায় লেজে গোবরে অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সেক্যুলারপন্থী এসব মুসলিম নাম ব্যবহারকারীদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার দিক থেকে মারাত্মক তিনটি ব্যধিতে আক্রান্ত হয়েছে।

এক ঃ এরা ইসলামকে শুধুমাত্র অনুষ্ঠান সর্বস্ব গতানুগতিক একটি ধর্ম বলে মনে করে।

দুই ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে শুধুমাত্র অন্যান্য ধর্মীয় নেতার মতো একজন ধর্মীয় নেতা মনে করে।

তিন ঃ মহাগ্রন্থ আল কোরআনকে শুধুমাত্র একটি ধর্মগ্রন্থ মনে করে।

ইসলাম বিদ্বেষী বামপন্থী ও সেক্যুলার পন্থীদের উপরোক্ত ৩টি মারাত্মক ভুল ধারণা সম্পর্কে কিছু আলোচনা একান্ত প্রয়োজন।

www.pathagar.com

এক ঃ মহান আল্লাহ প্রদত্ত ইসলাম শুধুমাত্র আচার-অনুষ্ঠান ও কিছু উপাসনা সর্বস্ব ধর্ম নয়, ইসলাম একটি সার্বজনীন কালজয়ী পূর্ণাঙ্গ ভারসাম্যপূর্ণ একমাত্র জীবন ব্যবস্থার নাম, যা শুধুমাত্র নামাজ-রোজা হজ্জ-যাকাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ইসলামের সার্বজননীতা সম্পর্কে মহান আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দ্বীন পরিপূর্ণ করে দিলাম, আর তোমাদের ওপর আমার (প্রতিশ্রুত) নেয়ামতও আমি পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের জন্যে জীবনের ব্যবস্থা হিসাবে আমি ইসলামকে দান করে সন্তুষ্ট হলাম।" (সূরা আল মায়েদা ঃ ৩)

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, ইসলামী অনুশাসন মানুষের জন্ম থেকে কবর পর্যন্ত জীবনের সকল দিক ও বিভাগে বিস্তৃত, যা মুসলিম দাবীদার সকল নর-নারী মানতে বাধ্য। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোনো ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন তখন কোনো মুমিন পুরুষ ও কোনো মুমিন নারীর এ অধিকার নেই যে, তারা সে বিষয়ে কোনো ধরনের ভিন্ন মত পোষণ করবে"। (সূরা আহযাব ঃ ৩৬)

সমাজতন্ত্রী, কমিউনিষ্ট, সেক্যুলারিষ্ট ও নাস্তিকরা বলে থাকেন- যার ধর্ম তার কাছে রাষ্ট্রের কি বলার আছে, ইসলাম সেকেলে আধুনিক যুগে অচল, ১৪শ বছরের পুরনো সভ্যতা, বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে চলতে পারে না ইত্যাদি ঢালাও মন্তব্য করে বিভ্রান্তি ছড়ানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। আর এ ধরনের বিষাক্ত অপপ্রচারে নতুন প্রজন্ম অতি সহজেই ইসলাম বিদ্বেষীদের খপ্পড়ে পড়ে যায়।

পবিত্র কোরআন-হাদীস দ্বারা এ কথা অকাট্য দলীলসহ প্রমাণিত যে, কালেমায় বিশ্বাসী কোনো মুসলিম তার জীবনের একটি খন্ডিত অংশে কোনো রকম দায়সারা গোছের নামাজ-রোজা ইত্যাদি আদায় করে ধর্ম পালনের ভনিতা করবে, আর জীবনের বিস্তীর্ণ অঙ্গনে তথা ব্যক্তি, পরিবার, সামজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি, শ্রমনীতি, আইন ও বিচার এবং অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে তা অমান্য করে ধর্মহীন জীবন-যাপন করবে, এধরনের বিন্দুমাত্র অধিকার কোনো মুসলিমকে দেয়া হয়নি। কারণ নবী করীম (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক শিশু স্বভাবধর্ম নিয়েই জন্মলাভ করে। তার পিতা-মাতাই তাকে ইয়াহুদী, নাছারা (বা বিভিন্ন ধর্মের) অনুসারী বানায়"।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেনে, "এমতাবস্থায় মৃত্যুবরণ করো না যে তুমি মুসলিম নও, অর্থাৎ মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"

(সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২)

www.pathagar.com

অতএব বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেলো, মুসলমনাদের জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত ইসলামকে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এমনকি মৃত্যুর পরের জগতে প্রবেশ মাত্র যে তিনটি প্রশ্ন করা হবে, তার একটি হচ্ছে, "তোমার দ্বীন কি ছিলো?"

অর্থাৎ তোমার ধর্ম কি ছিলো? সুতরাং এ কথা সার্বজনীন চির প্রতিষ্ঠিত সত্য যে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান আর আল্লাহ্ কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বিধান একটি বিশেষ যুগ, কাল বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এ বিধান সর্বকালের সর্বযুগের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে সমভাবে প্রযোজ্য। ইসলাম থেকে মুসলমানদের বিচ্যুত করার লক্ষ্যে যারা এ কথা বলে থাকে যে, 'ইসলাম একটি জীবন ব্যবস্থা হলেও তা বিশেষ একটি যুগ ও বিশেষ শ্রেণীর মানুষের জন্যে কল্যাণকর ছিলো। যুগের আবর্তন ও বিবর্তনের কারণে সকল যুগের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে ইসলাম কল্যাণকর নয়। আর এ কারণেই ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে'। এ ধরনের বালখিল্য যুক্তি উত্থাপন করে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার আবদার কেবলমাত্র ইসলামের আজন্ম শত্রুরাই জানাতে পারে।

ইসলাম সম্পর্কে সকলকে স্পষ্ট স্মরণ রাখতে হবে যে, ইসলাম কোনো সাম্প্রদায়িক, উগ্র, পরধর্ম অসহিষ্ণু, সঙ্কীর্ণ, অনুদার ধর্মমতের নাম নয়- ইসলাম জাতি-ধর্ম, বর্ণ, দল-মত, নারী-পুরুষ, দুর্বল-সবল, শিশু-কিশোর, তরুণ-যুবক প্রৌঢ়-বৃদ্ধ, কৃষক-শ্রমিক মেহনতী জনতা তথা সকল শ্রেণীর মানুষের জন্যে শান্তির একমাত্র শেষ আশ্রয় স্থল।

এ কথা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, নিজেদের ভোগ-বিলাস ও অবৈধ সম্পদের পাহাড় গড়ার পথে ইসলামকে অন্তরায় মনে করেই রাজনীতি থেকে ইসলামকে নির্বাসন দেয়ার মতলবি দাবী উত্থাপন করা হয়েছে। আর ঠিক এ কারণেই ইসলামের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করে পরগাছা নেতা সর্বস্ব বাম দলগুলো ও সেক্যুলার পন্থীরা ইসলাম থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে রেখে বিশেষ মতলব হাসিলের জন্য ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী অব্যাহত রেখেছে এবং দেশে ১৯৭২ সালের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান চালু করার দাবী জানাচ্ছেন।

যারা ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী তাঁরা নিঃসন্দেহে নিজেকে প্রতারিত করছেন। কারণ ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষ কখনোই ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হতে পারে না। 'নিরপেক্ষ' শব্দের অর্থই হচ্ছে পক্ষেও নয়- বিপক্ষেও নয়।

www.pathagar.com

ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গীতে মুসলমান তো দূরের কথা- অন্য কোনো ধর্মের অনুসারীও ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারেন না। নিজেকে ধর্মনিরপেক্ষ বলে দাবী করার অর্থ নিজের সাথে নিজেই প্রতারণা করার শামিল। আমাদের একথার স্বপক্ষে বাস্তব কয়েকটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করুন ঃ

একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ যখন পরনে ধুতী, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, গায়ে নামাবলী ও পৈতা জড়িয়ে, মাথায় টিকি, সিঁথিতে সিঁদুর ও হাতে শাখা পরেন, পূজা করেন এবং প্রত্যেহ মন্দিরে গিয়ে দেবতার পদপাদ্যে অর্ঘ-নৈবদ্য নিবেদন করেন, তখন তিনি কি আর ধর্মনিরপেক্ষ রইলেন? তিনি তো ধর্মের পক্ষেই চলে গেলেন।

একজন শিখ যখন গুরু নানকের অনুসারী হয়ে দাড়ি না কেটে মাথায় পাগড়ী পরেন এবং হাতে বালা ও কৃপাণ ধারণ করেন, গুরুদুয়ারায় গিয়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দেন তখন তো তিনি ধর্মের পক্ষেই থাকলেন। একজন বৌদ্ধ যখন গৌতম বুদ্ধের অহিংসা পরমধর্ম ও জীব হত্যা মহাপাপ নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে গেরুয়া বসন পরিধান করে আত্মার মহানির্বাণ লাভের জন্যে কৃচ্ছ-সাধন করেন, বোধিবৃক্ষকে পবিত্র জ্ঞান করে প্যাগোড়ায় যান তিনিও তো ধর্মের পক্ষই অবলম্বন করলেন।

একজন খৃষ্টান যখন যিশুখৃষ্টকে তাদের ত্রাণকর্তা প্রভু বলে বিশ্বাস করেন, গলায় ক্রশ ঝুলান, ত্রিত্ববাদ ও বাইবেলে বিশ্বাস করেন, মুখে যিশুর নাম উচ্চারণ করে প্রতি রবিবার গির্জায় প্রার্থনা করেন, আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট যখন বাইবেল স্পর্শ করে প্রেসিডেন্টের শপথ নেন এবং তাদের প্রতিটি ডলারে যখন ছাপার অক্ষরে লেখা থাকে IN GOD WE TRUST তখন তারাও তো আর ধর্মনিরপেক্ষ রইলেন না, ধর্মের পক্ষেই এলেন।

একজন মুসলিম পুরুষ যখন নামাজ-রোজা, হজ্জ ও উমরাহ পালন করেন, মুসলিম নারী যখন শালীন পোশাক তথা পর্দা করেন, হিজাব পরিধান করেন, আল্লাহ-রাসূল কোরআন-হাদীস, পরকাল, জান্নাত-জাহান্নামে বিশ্বাস করেন, তিনিও তো ধর্মের পক্ষেই অবস্থান নিলেন। এটাই যখন অটল বাস্তবতা, তাহলে 'ধর্মনিরপেক্ষ' রইলো কে? প্রকৃত বিষয় হচ্ছে ধর্মে বিশ্বাসী কোনো মানুষই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না।

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ সংযোজন করেছিলো। সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' বাক্যটি বাদ দেয়া হয়। শিক্ষাবোর্ডের সার্টিফিকেট থেকে 'ইকরা বিসমে রাব্বিকাল্লাযি খালাক' কোরআনের এই

www.pathagar.com

আয়াতটিও বাদ দিয়েছিলো কাজী নজরুল ইসলাম কলেজের নাম থেকেও 'ইসলাম' শব্দ বাদ দিয়ে জাতীয় কবির নামকে খন্ডিত করে কাজী নজরুল কলেজ রাখা হয়। ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ থেকে 'ইসলামিক' শব্দ বাদ দিয়ে কলেজটির ইসলামী চরিত্রই ধ্বংস করেছিলো। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়েছিলো। এভাবে দেশের অসংখ্য শিক্ষা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান থেকে 'ইসলাম ও মুসলিম' শব্দ মুছে দিয়েছিলো। ১৯৭২ সালের ধর্মরিপেক্ষ সংবিধান চালু করার দাবী যারা করছেন, তারা দেশ থেকে ইসলামী মূল্যবোধ বিদায় করে দেশের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলিম জনগোষ্ঠীকে আদর্শহীন হতে বাধ্য করার ষড়যন্ত্র করেছেন। এ দ্বারা প্রমাণিত হয় ধর্মনিরপেক্ষতা মানেই ধর্মহীনতা।

দুই ঃ বিশ্বমানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বাম ও সেক্যুলার পন্থীদের ধারণা অনুযায়ী শুধুমাত্র একজন ধর্মীয় নেতা অবশ্যই নন, তিনিই ঐতিহাসিক যুগে সর্বপ্রথম কল্যাণ রাষ্ট্রের সফল প্রতিষ্ঠাতা। মহাগ্রন্থ আল কোরআনে তাঁকে বিশ্বনবী ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁকে সমগ্র সৃষ্টি জগতের জন্য আল্লাহর করুণার মূর্ত প্রতীক বলা হয়েছে, তাঁর আনীত ও ঘোষিত সকল বিষয়ের প্রতি আত্মসমর্পণ করতে আদেশ দেয়া হয়েছে। জীবনে চলার সকল দিক ও বিভাগে কেবলমাত্র হযরত মুহাম্মদ (সা.) কেই 'আদর্শ' হিসেবে মেনে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুসলিম হিসেবে দাবীদার প্রত্যেককেই এ কথায় ঈমান রাখতে হবে যে, রাসূল (সা.) শুধুমাত্র নামাজের নেতৃত্বই দেননি। তিনি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, যুদ্ধ-সন্ধি, আন্দোলন-সংগ্রাম, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, ব্যবসা-বাণিজ্য, চুক্তি-নিরাপত্তা, অর্থ-সম্পদ, আইন-বিচার ও আমানত রক্ষায় তথা জীবন পরিচালনার সকল অঙ্গনে নেতৃত্ব দিয়েছেন। আর এসব ক্ষেত্রে তাঁকে নেতা মেনে তাঁর অনুসৃত পথ অনুসরণ করা মহান আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী মুসলমানদের জীবনে ফরজ দায়িত্ব।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "(আল্লাহর) রাসূল তোমাদের যা কিছু (অনুমতি) দেন তা তোমরা গ্রহণ করো এবং তিনি যা কিছু নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাকো।" (সূরা আল হাশর ঃ ৭)

সুতরাং বাম-সেক্যুলারপন্থীদের অজ্ঞতা ও মুর্খতাপ্রসূত ধারণানুযায়ী হযরত মুহাম্মদ (সা.) শুধুমাত্র ধর্মীয় নেতা নন,তিনি বিশ্বনবী এবং সর্বকালের সর্বযুগের সকল মানুষের জন্য আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা এবং সর্বশেষ নবী। সমগ্র জীবনে তিনি পবিত্র মুখে 'অসত্য' একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। অন্যের আমানত খেয়ানত করেননি, অন্যের হক নষ্ট করেননি,

www.pathagar.com

কাউকে কথা ও আচরণ দিয়ে কষ্ট দেননি। তিনি বর্ণ বৈষম্য দূরীভূত করেছেন, নারী ও শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। গোটা মানব সভ্যতায় তিনি তুলনাহীন। জীবনের চাইতেও তাঁকে বেশী ভালোবেসে তাঁর আনুগত্য করা মুসলমানদের ঈমানের দাবী।

তিন ঃ এ কথা সকলেরই স্মরণ রাখা প্রয়োজন, মহাগ্রন্থ আল কোরআন শুধুমাত্র ধর্মীয় নির্দেশ সম্বলিত সাধারণ কোনো পুস্তক নয়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেছেন, "(হে নবী) আপনার প্রতি আমি এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে রয়েছে সকল সমস্যার সমাধান"। (সূরা নহল ঃ ৮৯)

নবী করীম (সা.) বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে এমন এক সুস্পষ্ট জীবন বিধান দিয়ে যাচ্ছি যা রাত ও দিনের মতো সুস্পষ্ট। নির্ঘাত ধ্বংসের পথের যাত্রী ছাড়া অন্য কেউ এ থেকে বিচ্যুত হবে না।" (আল হাদীস)

আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন, "(জীবন পরিচালনার জন্য) আমার (নাযিলকৃত) হিদায়াত যারা অনুসরণ করে চলবে তার (দুনিয়ায়) বিপথগামী হবে না এবং (আখিরাতে) কোনো কষ্ট পাবে না।" (সূরা ত্বহা ঃ ১২৩)

তিরমিযী শরীফের একটি হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে, একবার নবী করীম (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "এমন এক সময় আসবে অন্ধকার রাতের মতো ফিত্না-ফাসাদ দুনিয়াকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। একজন সাহাবী জানতে চাইলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)!সে বিপদ থেকে বাঁচার উপায় কি? জবাবে নবী করীম (সা.) বললেন,"আল্লাহর কোরআনই বাঁচার একমাত্র পথ, এতে রয়েছে অতীত জাতীসমূহের ইতিহাস এবং ভবিষ্যৎ মানব গোষ্ঠির ঘটনাবলীর ভবিষ্যৎ বাণী এবং বর্তমানের প্রেক্ষিতে তোমাদের পারস্পরিক সম্পর্কিয় আইন। বস্তুত কোরআন চূড়ান্ত বিধান, কোনো অবহেলার জিনিস নয়।" (তিরমিযী)

যে কোরআন ছিলো মুসলমানদের শক্তির উৎস, যে কোরআন নেতৃত্বের আসনে মুসলমানদের বসিয়ে ভাগ্যের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিলো, বেদুঈন, রাখাল ও ক্রীতদাসদের ন্যায়পরায়ণ শাসক, দিগ্বিজয়ী বীর সেনাপতি ও বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত করেছিলো, সেই কোরআনের সাথে আজকের এক শ্রেণীর মুসলমানদের সম্পর্ক শুধু সওয়াবের নিয়তে না বুঝে তিলাওয়াত করা। অথচ কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্যই ছিলো এ মহাগ্রন্থের আলোকে মুসলিম উম্মাহ তাদের ব্যক্তি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করবে এবং এই কোরআনে বর্ণিত বিধান অনুযায়ী অর্থনীতি, ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প-সংস্কৃতিসহ জীবনের বিশাল অঙ্গনকে ঢেলে সাজাবে। এ সম্পর্কে হযরত ইমাম মালেক (রাহ.)

www.pathagar.com

বলেছেন, "মুসলিম জাতি যে জিনিসের বদৌলতে একদিন কল্যাণ ও মঙ্গল লাভ করেছিলো শেষ যুগেও তারই সাহায্যে (অর্থাৎ সেই কোরআনের সাহায্যেই) কল্যাণ লাভ করবে (এর কোনোই বিকল্প নেই)।"

(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, ২য় খন্ড)

প্রকৃত-পক্ষে পবিত্র কোরআন মানুষের জীবন চলার পথ নির্দেশিকা, এতে শুধু নামাজ-রোজার কথাই বলা হয়নি। এতে বলা হয়েছে মানুষের জন্য যা কিছু প্রয়োজন তা সবই। এক কথায় জীবন চলার সকল নীতির মূলনীতি বর্ণিত যে কিতাব, তারই নাম মহাগ্রন্থ আল কোরআন। হতভাগ্য বামপন্থীরা এ পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। এ মহা অজ্ঞতা ও মূর্খতার কারণেই সকল বাম ও সেক্যুলার পন্থীরা ইসলামকে শুধুমাত্র ধর্ম, হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে শুধু ধর্মীয় নেতা আর কোরআন মজীদকে শুধুমাত্র একটি ধর্মীয় পুস্তক মনে করে।

এ ত্রিবিধ মহাক্যান্সার ব্যাধিতে আক্রান্ত বামরা-সারা দেশে সর্বসাকুল্যে যাদের দুই হাজার কর্মীও নেই, তারাই একটি সেক্যুলার দলের আশ্রয়ে-প্রশ্রয়ে জলাতঙ্ক রোগীর মতো ইসলামকে ভয় পায় এবং ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার মামা বাড়ির আব্দার তোলে। ১৪ কোটি মুসলিম অধ্যুষিত প্রিয় জন্মভূমি বাংলাদেশে বামদের এ দুরাশা কোনো দিন পূর্ণ হবে না ইনশাআল্লাহ।

বাংলাদেশে যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করে ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ প্রতিষ্ঠার কথা বলেন, তাদের কাছে আমরা বিনয়ের সাথে আরো কিছু কথা আরজ করতে চাই। ভারতে বসে যেসব নেতারা আমাদের কল্যাণের কথা ভাবেন এবং ভারতের যেসব রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ এদেশ সফরে এসে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদকে এদেশের রাষ্ট্রীয় নীতিমালায় সংযোজনের নসিহত খয়রাত করেন তাদের দিকে তাকিয়ে দেখুন তো, তারা কি প্রকৃতই ধর্মনিরপেক্ষ– না ধর্মরিপেক্ষতার নামাবলী গায়ে দিয়ে ইসলামী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে নির্মূল করে নিজেদের ধর্মীয় ভাবাদর্শ ও সংস্কৃতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দিতে চান?

লক্ষ্য করুন, ভারত তাদের রাষ্ট্রীয় ভবনের নামকরণ করেছে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত ত্রিমূর্তি ভবন, যা কিছু অস্ত্র আবিষ্কার করছে সেগুলোর নামকরণও ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই করছে, ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতেই জাতীয় সংগীত রচনা করেছে, জাতীয় পতাকাতেও রয়েছে ধর্মীয় চিহ্ন অশোক চক্র, রাষ্ট্রীয় পুরস্কারসমূহের নামকরণও করেছে ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে, ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীও তাঁর ধর্মীয় প্রতীক পাগড়ী ব্যবহার করেন এবং মুখে দাড়িও রেখেছেন। ধর্মনিরপেক্ষতার দাবীদার ভারতের অধিকাংশ নেতা নিয়মিত পূজা-পার্বন করে কপালে তিলক ব্যবহার, ধর্মীয় রীতিতে দুই হাত জোড় করে

www.pathagar.com

নমস্কার জানান এবং ধর্মীয় লেবাস পরিধান করেন। রাখি বন্ধন পালন করেন ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদিতে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে ধর্মীয় নীতি অনুযায়ীই উদ্বোধন করেন। বিয়েও করেন ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী। আমাদের দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকেও তারা তাদের ধর্মীয় রীতিতেই তিলক-চন্দন পরিয়ে 'দেশীকোত্তম' ডিগ্রী দিয়েছিলো।

বিশ্ব বিখ্যাত চলচ্চিত্র অভিনেতা ভারতের অমিতাভ বচ্চন জ্যোতিষীদের গণনা অনুযায়ী তাঁর পুত্র অভিষেক বচ্চনের জন্য নির্বাচিত পাত্রী অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রায়ের নিয়তি থেকে অমঙ্গল দূর করার জন্যে ধর্মীয় নির্দেশ অনুসরণ করে প্রথমে তাকে বৃক্ষের সাথে বিয়ে দিয়ে পরবর্তীতে নিজের সন্তানের সাথে বিয়ে দেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সূচনা দেবদেবীর বন্দনা দিয়েই শুরু করা হয়, ভারতের রাষ্ট্রীয় দলীল-দস্তাবেজ, চিঠি-পত্রে দেবতা ব্রহ্মার প্রতীক ব্যবহার করা হয়। এভাবে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের ধর্মকে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং শুধুমাত্র ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নসিহত খয়রাত করেন।

এবার আমেরিকার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, তারা তাদের মুদ্রার ওপর লিখেছে 'আমরা গড-এ বিশ্বাসী' এবং আমেরিকার নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইবেল স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করেন। বিয়ের ক্ষেত্রেও তারা ধর্মীয় পোশাকে সজ্জিত হয়ে গির্জায় গিয়ে ধর্মীয় রীতিতেই বিয়ে করেন এবং মৃত্যুর পরেও ধর্মীয় রীতিতেই সৎকার করেন। নিজেদের ধর্ম এবং ধর্মীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কেউ যেকোন 'টু' শব্দ করতে না পারে এ জন্য তারা ব্লাসফেমী আইন বলবৎ করেছে।

অথচ তারাই চরম সাম্প্রদায়িকতায় উদ্দীপ্ত হয়ে ইউরোপের বুকে কোনো মুসলিম রাষ্ট্র বরদাশত করা হবে না বলে ঘোষণা দিয়েছে। তাদের দেশের পত্র-পত্রিকা, প্রচার মাধ্যমে কবিতা-সাহিত্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে খিস্তি-খেউড় লেখা হচ্ছে, নবী করীম (সা.) এর প্রতি ব্যঙ্গাত্মক লেখা ও কার্টুন ছাপা হচ্ছে। পবিত্র কোরআন, হাদীস, নবী করীম (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধে যে যত বেশী আপত্তিকর কথা লিখতে পারে, তাকে তারা ততবেশী সম্মান-মর্যাদা দিয়ে 'নাইট' উপাধিসহ নানা ধরনের পুরস্কারের মাধ্যমে তার জন্যে নিচ্ছিদ্র নিরাপত্তার বলয় রচনা করে। গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে অফিস বা শিক্ষাঙ্গনে আসায় বাধা না থাকলেও মুসলিম মেয়েদের জন্যে হিজাব পরিধান করে অফিস বা শিক্ষাঙ্গনে আসতে বাধার সৃষ্টি করে। কোনো মুসলমান পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হবার পরে সে কোরআন স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করতে চাইলেও বাধার সৃষ্টি করে। ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ

www.pathagar.com

পোষণ করার কারণে এদেশে যারা জনগণের ঘৃণা কুড়ায়, তাদেরকে তারা নিজের দেশে সসম্মানে স্থান দিয়ে পুরস্কৃত করে। এমনকি আমাদের দেশের একজন নাস্তিক ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী নারীবাদী লেখিকার পক্ষ নিয়েও খোদ আমেরিকার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন সাফাই পেশ করেছিলেন।

কেউ যদি হিন্দু বা খৃষ্ট ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতো এবং যা খুশী তাই লিখতো, তাহলে ভারত, ইউরোপ ও আমেরিকা কি উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়ে জামাই আদরে রেখে নানা পুরস্কারে ভূষিত করে নাইট উপাধি দিয়ে তার জন্যে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতো? এটাই হলো তাদের ধর্মনিরপেক্ষতার নমুনা। মুসলমানরা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা অনুসরণ করার চেষ্টা করলেই তারা একে মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িক বলে আখ্যায়িত করছে। আসলে তারা নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক হলেও ইসলাম ও মুসলমানদের ক্ষেত্রে নানা কৌশল অবলম্বন করে মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতার নসিহত খয়রাত করেন।

এতক্ষণে দলীল ভিত্তিক আলোচনায় প্রমাণিত হলো, দেশে ধর্মভিত্তিক তথা ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী কোনো মুসলিমের মুখে অন্তত উচ্চারিত হতে পারে না। যাদের মুখে এ দাবী উচ্চারিত হচ্ছে, তারা বিশেষ মতলবেই এ দাবী উত্থাপন করে চলমান সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করছে। এবার ধর্মীয় রাজনীতির সাংবিধানিক ভিত্তি সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাই।

ধর্মীয় রাজনীতির সাংবিধানিক ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান সংবিধানের প্রস্তাবনায় সুস্পষ্টভাবে চারটি মূলনীতির কথা উল্লেখ রয়েছে। প্রস্তাবনার ২নং প্যারায় বলা হয়েছে, "আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, যে সকল মহান আদর্শ আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের সেই সকল আদর্শ এই সংবিধানের মূলনীতি হইবে।"

অর্থাৎ উপরিউক্ত চারটি আদর্শই বর্তমান সরকারের মূলনীতি। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতিতে যদিও ধর্মনিরপেক্ষতা অন্তর্ভুক্ত ছিলো কিন্তু Proclamation order no-1 of 1977 এর মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার

www.pathagar.com

পরিবর্তে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসকেই সংবিধানের মূলনীতি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি আজ ঐতিহাসিক সত্য। এই অন্তর্ভুক্তি ঠিক হয়েছে কিনা এবং না করলে কি হতো? মুক্তিযুদ্ধের মূলমন্ত্র কোনটি ছিলো? পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মূলনীতি পরিবর্তন করা হয় কিনা? ঘোষণার মাধ্যমে মূলনীতি পরিবর্তন করা বৈধ কিনা? এই প্রশ্নগুলো নিতান্তই অবান্তর, কারণ ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে এই মূলনীতি পরিবর্তন করে সাংবিধানিক বৈধতা দেয়া হয়েছে। বাস্তব সত্য হলো ১৯৭৭ থেকে আজ পর্যন্ত আমরা 'আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এই নীতির ওপর অবিচল আছি এবং এটি বর্তমানে অটল বাস্তবতা। হয়তো মূল সংবিধান প্রণয়নকারীদের অনেকেই এর সাথে ঐকমত্য পোষণ করবেন না কিন্তু ১৯৭৭ পরবর্তী প্রজন্ম সংবিধানকে বর্তমান অবস্থায় মেনে নিয়ে এর আনুগত্য করছে এটাও অটল বাস্তবতা। বুদ্ধিজীবী মহলের কেউ কেউ পুনরায় ১৯৭২-এর সংবিধানের চেতনায় ফিরে যাবার দাবী উত্থাপন করেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে ৩০ বছর পূর্বের সত্যটি কি ভুলা যাবে? একটি জাতির জন্য ৩০ বছর অনেক লম্বা সময় এবং জাতীয় জীবনে গত ৩০ বছরে 'মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস' এই নীতির প্রতিফলন ঘটেছে।

সেক্যুলার পন্থীগণ হয়তো বলবেন, আমাদের জাতীয় জীবনে ধর্মনিরপেক্ষতারও প্রতিফলন ঘটেছে। সাংবিধানিকভাবে এ দেশ যে কয় বছর ধর্মনিরপেক্ষ ছিলো, সেই কয় বছরে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়েও এ দেশের জনগণের মন-মানসিকতা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আকৃষ্ট করা তো যায়নি বরং ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করার কারণে এই মতবাদের প্রতি এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের প্রবল ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছে। যার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিলো ৭ই নভেম্বরে সিপাহী-জনতার মিছিলে 'আল্লাহু আকবার' শ্লোগানের মাধ্যমে। তর্কের খাতিরে তারপরও বলা যায়, যে কয় বছর এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা-চেতনার বিপরীত ধর্মনিরপেক্ষ নীতির প্রতিফলন ঘটানোর ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়েছিলো, তার তুলনায় ৫ গুণ অধিক সময় ব্যাপী 'মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থার' নীতি রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আর এই চেতনা এ দেশের জনগণের শুধু চিন্তা-চেতনার সাথেই সম্পর্কিত নয়, রক্তের প্রত্যেকটি কণিকাকে এ চেতনা সচল করে রেখেছে।

তাত্ত্বিকভাবে অধিকাংশ জনগোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষ নীতির সাথে ঐকমত্য পোষণ না করলেও এটা বাস্তব সত্য যে, ১৯৭১ থেকে ৭৭ পর্যন্ত ধর্মনিরপেক্ষতাই

www.pathagar.com

ছিলো এ দেশের সংবিধানের ভিত্তি। অপরদিকে 'মহান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা' এই নীতির সাথে ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তব চেহারা দেখে আমরা জাতি হিসেবে ধর্ননিরপেক্ষতা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছি। বর্তমানে সাংবিধানিকভাবে আমরা সেক্যুলার রাষ্ট্র নই এবং এ মীমাংসিত বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তোলারও কোনো অবকাশ নেই। দেশের গৌরবজনক মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাদের অধিকাংশ ছিলেন মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী এবং যুদ্ধকালীন সময়ে তাঁরা নিয়মিত নামাজ আদায়, কোরআন তিলাওয়াত ও রোজা রেখে বিজয়ের জন্য মহান আল্লাহর সাহায্য ভিক্ষা চেয়েছেন।

এ কথা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিলো তা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ বা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে নয়, অধিকাংশ মুক্তিযোদ্ধা নিজেদের ঈমান-আকিদা বিসর্জন দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠা করার জন্যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেননি। যুদ্ধ করেছিলেন পাকিস্তানীদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণ ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে, তাদের জ্বালাও-পোড়াও নীতি ও হত্যা-ধর্ষণের বিরুদ্ধে একটি শোষণমুক্ত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জিত হবার পর তদানীন্তন শাসকবর্গ ভারত থেকে ধার করা ধর্মনিরপেক্ষ মতবাদ এবং রাশিয়ার বস্তা পচা সমাজতন্ত্র সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করে ১৯৭১ থেকে ৭৫ পর্যন্ত জাতির ঘাড়ে সিন্দাবাদের দৈত্যের মতো চাপিয়ে দিয়েছিলো। এর পরের ইতিহাস বাস্তবতার ইতিহাস। তা হচ্ছে ১৯৭৭ থেকে উক্ত নীতিমালা পরিবর্তন করে আজ অবধি ধর্মীয় রাজনীতির বৈধতা বিদ্যমান রয়েছে।

সুতরাং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি কোনটি হওয়া উচিৎ এ নিয়ে বিতর্ক তোলার কোনো অবকাশ নেই। কারণ এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর অন্তরে যে চিন্তা-চেতনা লালন করছে,তাদের রক্তের প্রত্যেকটি কণিকায় যে চেতনা অনুক্ষণ শানিত রয়েছে, সেই চেতনাই ৭৭ পরবর্তী সংবিধানে সংযোজিত হয়েছে এবং এই চেতনার উপরই সমগ্র জাতি এখন পর্যন্ত অবিচল রয়েছে। সুতরাং এ কথা বাংলাদেশের প্রত্যেকটি নাগরিকই সাংবিধানিকভাবে মানতে বাধ্য যে, "সংবিধানের মূলনীতিই দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের উৎস হওয়া উচিৎ"। অর্থাৎ প্রত্যেকটি দলের গঠনতন্ত্র দেশের সংবিধানের সাথে Contradictory হওয়া যাবে না এবং এটাই একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের সংবিধানের দাবী। আর বিশেষ করে যে দেশটির স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে এক সাগর রক্তের বিনিময়ে।

দেশের সরকার পদ্ধতি, সুশাসন ও উন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক থাকাটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। কিন্তু সংবিধান নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা মোটেও

www.pathagar.com

সমীচীন নয়। এ বিতর্ক তোলা সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যমূলক ও আত্মঘাতী। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কর্মকাণ্ড নিয়ে সমালোচনা আর সংবিধানের মূলনীতির সমালোচনা কখনোই এক হতে পারে না। স্বাধীন রাষ্ট্রের মূলনীতিসমূহ দলীয় গঠনতন্ত্রে প্রতিফলিত হয়ে সরকারের চালিকাশক্তি হতে হবে। যেহেতু গণতান্ত্রিক উপায়ে কোনো না কোনো দল সরকার গঠন করে, সেহেতু দলীয় গঠনতন্ত্রই রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বাস্তব ভূমিকা রাখে। কারণ দলের কর্ণধাররাই গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসারে রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। আর ঠিক এ কারণেই দলীয় গঠনতন্ত্রে দেশের সাংবিধানিক মূলনীতি প্রতিফলিত না হলে সরকারের কর্মকাণ্ডে সাংবিধানিক মূলনীতিসমূহও প্রতিফলিত হয় না।

সুতরাং বর্তমানে সংস্কারের যে পথ অনুসরণ করার কথা বলা হচ্ছে, সেই পথ অনুসারে যাচাই করতে হবে দেশের রাজনৈতিক দলসমূহের গঠনতন্ত্রে দেশের সাংবিধানিক মূলনীতির কতটুকু প্রতিফলন রয়েছে। যদি সাংবিধানিক মূলনীতির প্রতিফলন দলের গঠনতন্ত্রে না ঘটে থাকে তাহলে দেশের সংবিধান অনুসারে প্রত্যেকটি দলের গঠনতন্ত্রে সংস্কার সাধন করতে হবে। দলীয় গঠনতন্ত্রে যদি দেশের সংবিধানের ভিত্তিতে সংস্কার করা না হয়, তাহলে অতীতের ন্যায় দেশের সরকার প্রধানের পক্ষে আগামীতেও বিদেশে গিয়ে দেশের সাংবিধানিক চেতনার বিরুদ্ধে নিজের দলের অবস্থান তুলে ধরার দ্বার উন্মুক্ত থাকবে। আর এটা হবে একটি স্বাধীন দেশের জাতিসত্তার বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের শামিল। সুতরাং বর্তমানে অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে সবথেকে বড় বিচার্য ও সংস্কারের বিষয় "রাষ্ট্রের সংবিধানের মূলনীতির" প্রতি মনোযোগী হয়ে রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সংস্কার সাধন করতে হবে।

প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২ (ক) এ বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।"

উল্লেখিত এই অনুচ্ছেদটি ১৯৭২ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। এমন কি পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমেও জেনারেল জিয়াউর রহমান এই অনুচ্ছেদটি সংযুক্ত করেননি। ১৯৮৮ সালের ৭ই জুন সংসদে ৮ম সংশোধনী বিলটি গৃহীত হয় এবং রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভের পর ৯ই জুন তা সাংবিধানিক আইনে পরিণত হয়। বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ এই মহৎ কাজটি সম্পাদন করেন। কিন্তু বর্তমানে সেই এরশাদ সাহেবই কোন সুতোর

www.pathagar.com

টানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীদারদের সুরে সুর মিলাচ্ছেন যা বুদ্ধিজীবী মহলের হাসির খোরাক যোগাচ্ছে।

১৯৭৭ সালে Proclamation order no-1 of 1977 এর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনায় যে পরিবর্তন আনা হয় এরই ভিত্তিতে সংবিধানের ১২ নং অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত করা হয়। অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১২ নং অনুচ্ছেদে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিটি গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু সময়ের ব্যবধানে বাস্তবতার নিরিখে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা-চেতনার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করে ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানের প্রস্তাবনার মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্য রাখার স্বার্থে ১২ নং অনুচ্ছেদটি বাতিল করা হয় এবং আজ অবধি সংবিধানের ১২নং অনুচ্ছেদটি পরিত্যক্ত বা বিলুপ্ত অবস্থায় রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৩৮ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "জনশৃঙ্খলা ও নৈতিকতার স্বার্থে আইনের দ্বারা আরোপিত যুক্তিসংগত বাধা-নিষেধ সাপেক্ষে সমিতি বা সংঘ গঠন করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের থাকিবে"।

১৯৭২ সালের সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের একটি Proviso সংযুক্ত ছিলো। কিন্তু ১৯৭৬ সালে Proclamation order of 1977 (2nd Proclamation order no-III of 1976) এর মাধ্যমে Proviso টি বিলুপ্ত করা হয় এবং আজ অবধি তা বিলুপ্ত অবস্থায় রয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩য় ভাগের অনুচ্ছেদ (২৬-৪৭) (ক) পর্যন্ত মৌলিক অধিকারের বর্ণনা রয়েছে এবং ৩৮ নং অনুচ্ছেদ মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় যদি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই অধিকার হরণ করতে চায় তাহলে ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ঐ ৩৮ ধারায় বর্ণিত মৌলিক অধিকার বলবৎ করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন।

মৌলিক অধিকার ও মৌলিক চাহিদার মধ্যে একটি বড় ধরনের পার্থক্য রয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৫(ক) এ অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবন ধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থাকে 'মৌলিক প্রয়োজন' হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও এই মৌলিক প্রয়োজনসমূহ রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত করতে না পারলে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনের শরণাপন্ন হতে পারবেন না। কারণ মৌলিক প্রয়োজনসমূহ মেটানো রাষ্ট্রের

www.pathagar.com

অর্থনৈতিক সামর্থ্যের ওপর নির্ভরশীল। রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে সামর্থ্যবান না হলে এই চাহিদাগুলো পরিপূর্ণ করা বাস্তবসম্মত নয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের কোনো নাগরিকের অন্নের ব্যবস্থা রাষ্ট্র কর্তৃক নিশ্চিত না হলে কোনো সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আদালতের শরণাপন্ন হয়ে অন্নের (খাদ্য) ব্যবস্থা করার জন্য রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে পারবেন না। নীতিগতভাবে এই প্রয়োজনসমূহ মেটানোর জন্য রাষ্ট্র চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। কারণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২য় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে যে বিষয়গুলোকে স্থান দেয়া হয়েছে সেগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে প্রযোজ্য। অপরপক্ষে সংবিধানের ৩য় ভাগে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে যে অধিকারগুলো উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো রাষ্ট্র কর্তৃক বলবৎ যোগ্য অর্থাৎ যদি কোনো নাগরিকের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয় তাহলে সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ এ মৌলিক অধিকারটি আইনের মাধ্যমে বলবৎ করবে।

বহুল আলোচিত Writ petition গুলো সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে হাইকোর্ট বিভাগ শুনানি করে থাকে এবং Facts finding এর ভিত্তিতে রায় প্রদান করে থাকে। যেহেতু অনুচ্ছেদ ৩৮ মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান (সরকারসহ) যদি এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত অধিকারটি লংঘন করে, তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতে Writ petition এর মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য হবে।

সুতরাং বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারেই দল, সংগঠন, সমিতি ও সংঘের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তথা গণতান্ত্রিক পন্থায় ইসলামী আদর্শ রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রচেষ্টা চালানো এ দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার। এই অধিকার হরণ করা বা এর বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করার সুযোগ দেশের সংবিধান কাউকে দেয়নি। সংবিধান অনুযায়ী ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবী সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, অসাংবিধানিক এবং এ দাবী যারা তুলছেন তারা অবশ্যই দেশের সংবিধানের বিপরীতে অবস্থান গ্রহণ করছেন।

www.pathagar.com

দেশ-বিদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল

এ কথা রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি মাত্রই অবহিত যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চালু রয়েছে এবং তা নিয়ে সেসব দেশের কারো মাথায় কোনো যন্ত্রণা নেই। যেমন- আলজেরিয়ায় ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট, তুরস্কে জাস্টিস এন্ড ডেভলেপমেন্ট পার্টি, যারা এখন নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী বেশ কয়েকটি প্রদেশে নির্বাচনের মাধ্যমে বিজয়ী হয়ে টিকে আছে। ফিলিস্তিনে হামাস, লেবাননে হিযবুল্লাহ, সুদানে দি উম্মাহ পার্ট, মালয়েশিয়ায় দি প্যান মালয়েশিয়া ইসলামিক পার্টি, ইন্দোনেশিয়ায় দি মুসলিম স্কলার্স পার্টি, জর্ডানে মুসলিম ব্রাদার হুড, শ্রীলঙ্কায় জামায়াতে ইসলামী শ্রীলঙ্কা, আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে জামায়াতে ইসলামী হিন্দ, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ, ধর্মভিত্তিক দল বিজেপি ভারতে বিগত পার্লামেন্টে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো। এছাড়াও সেখানে রয়েছে শীব সেনা রাষ্ট্রীয় সেবা সংঘ ইত্যাদি নামে ধর্মীয় দল।

একইভাবে ইউরোপ, আমেরিকাসহ বিশ্বের যে দেশে গণতন্ত্র আছে সেখানেই ইসলামসহ বিভিন্ন ধর্মভিত্তিক দলের অস্তিত্ব স্বগৌরবে টিকে আছে এবং সেসব দল নিজ নিজ দেশে নির্বাচনেও অংশগ্রহণ করছে। ইউ, কে তে Monarch is the head of the church. তিনিই supreme defender of protestant faith. যুক্তরাজ্যের সাবেক প্রধান মন্ত্রী ব্লেয়ার ইচ্ছে থাকা সত্যেও protestant faith থেকে catholic faith এ যেতে পারেননি। অবসর নেয়ার পর এখন catholic faith এ যাচ্ছেন। সুতরাং যে ইউ, কে, থেকে আমরা সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি পেয়েছি সেখানেই যখন এই ব্যবস্থা, তখন আর secularism কোথায় আছে?

অথচ আমরা অবাক বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করছি পৃথিবীর ৩য় বৃহত্তম মুসলিম দেশ বাংলাদেশ যে দেশের ৯০ ভাগ অধিবাসী জন্ম সূত্রে মুসলমান, যে দেশের সংবিধান শুরু হয়েছে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দিয়ে, যে দেশের সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম ঘোষিত, যে দেশের সংবিধানের সর্বশক্তিমান আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসের কথা উল্লেখ রয়েছে, সেই বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি তথা ইসলামী দলগুলো নিষিদ্ধি ঘোষণার দাবী উঠেছে। যারা এ দাবী উত্থাপন করেছে তারা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক। তাদের স্বপ্ন ধর্মভিত্তিক রাজনীত নিষিদ্ধ করতে পারলে এদেশ নাস্তিক্যবাদী ও

www.pathagar.com

সেক্যুলার পন্থীদের একচেটিয়া ধর্মহীন রাজনীতি চালু করা সহজ হবে এবং ঘনিষ্ঠ একটি দেশের নীল নকশা অনুযায়ী দেশ পরিচালনার সুযোগ কার্যকরী হবে। সেই সাথে নীতি-নৈতিকতাহীন পাশ্চাত্যের নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার কালচার চালু করার সুবর্ণসুযোগ হাতের মুঠোয় এসে যাবে। ইয়াবা সংস্কৃতির মত অপসংস্কৃতি দেশকে গ্রাস করে ফেলবে।

ভোটের মাধ্যমে মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশে জীবনেও আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না এটা তারা নিজেরাও জানে। তাই ওদের কাজই হলো কারণে অকারণে দেশের জনগণকে বিভিন্ন নন-ইস্যু বা ডেড ইস্যুকে ইস্যু বানিয়ে জাতিকে বিভক্ত করে দেশের অগ্রগতি ও উন্নতি ব্যহত করা, ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা এবং সরকারকে বিব্রত অবস্থায় রাখা। যাতে করে সরকার ঠাণ্ডা মাথায় দেশ পরিচলনায় যোগ্য ভূমিকা পালন করতে না পারে। ইলেক্ট্রোনিক ও প্রিন্টিং মিডিয়ার করুণাশ্রিত, কোরামিনে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সংগ্রামে লিপ্ত ধর্মবিদ্বেষী বাম তথা সেক্যুলার পন্থীদের ব্যাপারে গোটা জাতিকে এদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত সম্পর্কে সজাগ সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।

এমতবস্থায় মুসলিম দেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবী আল্লাহ ও তার রাসূল (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল। সুতরাং দেশ ও জাতি বিরোধী, ঈমান-আকীদা ও দেশের সংবিধান বিরোধী এ মহা ষড়যন্ত্র এখনই ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়ানো সময়ের দাবী।

অন্যথায় ধর্মহীন, নাস্তিক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, সুশীল ও ইসলামের জঘন্য দুশমন বামপন্থীদের কূট-চালে জাতি বিভক্ত হবে, নির্বাচন কমিশন বিতর্কিত হবে এবং বর্তমান সরকারের বহু কাঙ্ক্ষিত নির্বাচনী রোড ম্যাপ ভেস্তে যাবে। অসম্ভব নয় দেশ সর্বনাশা গৃহযুদ্ধের দিকে এগিয়ে যাবে। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণার দাবীর মাধ্যমে ওরা সেটাই চায়। মহান আল্লাহ তা'য়ালা দেশবাসীকে বাম ও সেক্যুলার পন্থীদের ষড়যন্ত্র বুঝে তা প্রতিহত করার তাওফীক দান করুন।

-- o --

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায় আঞ্জুমানে আয়িম্মায়ে মাসাজিদ
৫৩৪, পেয়ারাবাগ জামে মসজিদ, ঢাকা-১২১৭

প্রকাশকাল অগ্রহায়ণ-১৪১৪, নভেম্বর- ২০০৭

নির্ধারিত মূল্য ২.০০ টাকা মাত্র